প্রবন্ধ ১

কালীয়দমন

আজ নাগপঞ্চমী। শ্রাবণের শুক্লা পঞ্চমী। সাপকে আমরা ভয় পাই, আবার পুজো করি। এই প্রাণীটির সঙ্গে আমাদের নদীমাতৃক সমাজের সহবাসের কাহিনিতে ধরা আছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ইতিহাস।

জহর সরকার

৭ অগস্ট, ২০১৬, ০০:০০:০৮

শ্রাবণ মাস এলে চাষিদের মুখে হাসি ফোটে, কবিদেরও, কিন্তু এই সময় সাপেরা তাদের বানভাসি ঘরবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে, মানুষ তাদের ভয় পায়, পুজোও করে। সেই কারণেই শ্রাবণের শুক্লা পঞ্চমীকে নাগপঞ্চমী হিসেবে পালন করা হয়। এ বছর আজ সেই তিথি। সাপকে আমরা ভয় পাই, কিন্তু এই প্রাণীটির কাহিনিতে শত শত, হাজার হাজার বছর ধরে ভারতীয় মনের বিবর্তনের কথা ধরা আছে।

জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের কাহিনিতে সাপ সম্পর্কে পশ্চিমী-আর্য মনের বিরূপতার পরিচয় আছে। কিন্তু এই একই প্রাণী কালক্রমে নাগরাজ এবং মনসা (ছবিতে তাঁর থান) রূপে পূজিত হল। বলা দরকার, এই দুটি কিন্তু এক নয়। প্রথম জন পুরুষ, দ্বিতীয় জন নারী। তাতে অবশ্য বেশি দোষ ধরা যায় না, কারণ সাপের স্ত্রী-পুরুষ বিচারের জন্য বেশি কাছে যাওয়া নিরাপদ নয়, এমনকী পুজো করার সময়েও। প্রাচ্য পৃথিবীতে ধানই প্রধান শস্য। জমিতে প্রচুর জল না থাকলে ধান হয় না, আর জল থাকা মানেই সাপ থাকা। কিন্তু সাধারণত জলের সাপ বিষধর নয়, তাদের না ঘাঁটালে কামড়ায়ও না।

সাপের কাহিনিগুলিতে উচ্চবর্গের সংস্কৃতির সঙ্গে লোককৃষ্টির একটা টানাপড়েন আছে। বাংলার আদি লোককথায় মনসা ছিলেন, তিনি পরে পদ্মাবতীতে পরিণত হলেন, পদ্মপাতায় শিবের বীর্যপাতের ফলে যাঁর জন্ম। উত্তর এবং পশ্চিম ভারতে পিতৃতন্ত্রের প্রাবল্য, সেই তুলনায় পূর্ব ও দক্ষিণে মাতৃশক্তির প্রাধান্য, এটাও সাপের কাহিনিতে প্রতিফলিত। মহাভারতে বিনতার পুত্র

গরুড়ের সঙ্গে তাঁর বোন কদ্রুর সর্প-সন্তানদের সংঘর্ষের মনোজ্ঞ বিবরণ আছে। আদিপর্বে ও অন্যত্র সাপকে অশুভ বা রহস্যময় শক্তি হিসেবে দেখানো হয়। পরবর্তী যজুর্বেদ বা অথর্ব বেদে সাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মন্ত্রপাঠের বিধি আছে, পরে গৃহ্যসূত্রেও সাপকে সম্মান জানানোর জন্য বার্ষিক আচারের বিধান দেওয়া হয়। আর্যদের ভাষায় 'নাগ' শব্দটিও দ্ব্যর্থবোধক: এক দিকে তার মানে সাপ, অন্য দিকে আর্য-বৈদিক সংস্কৃতির বিরোধী আদিবাসীদেরও নাগ বলা হত, আর্যরা তাঁদের 'উভচর' বলে গণ্য করতেন, কারণ তাঁরা স্থলে ও জলে বসবাসে সমান অভ্যস্ত। যমুনার পূর্ববর্তী ভূখণ্ডের জীবনযাত্রার সঙ্গে মানিয়ে নিতে বৈদিক এবং উত্তর-বৈদিক সভ্যতার অনেকটা সময় লেগেছিল, এবং গাঙ্গেয় অববাহিকার জলজঙ্গলে নানান বন্যপ্রাণীর সঙ্গে সঙ্গে সাপখোপের প্রাচুর্য তার একটা কারণ।

আর্যপুত্ররা অনেক সময়েই নাগ পুরুষদের দক্ষতা এবং নাগ মেয়েদের মোহিনী মায়ার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারত না। অর্জুন ব্যাপারটা সামলে নিয়ে নাগ রাজকন্যা উলুপীকে বিয়ে করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর পৌত্র পরীক্ষিৎকে সাপের কামড়ে প্রাণ হারাতে হয়। পরীক্ষিতের ছেলে জনমেজয় সর্পযজ্ঞ করে সমস্ত সাপকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সর্পরাজ বাসুকির ভাইপো আস্তিক সেই লক্ষ্য পূরণে বাধা হয়ে দাঁড়ান। এই পুরাণকথাগুলি গাঙ্গেয় অববাহিকার বিরাট সভ্যতার সঙ্গে আর্যদের তীব্র টানাপড়েনের পরিচয় বহন করে।

বৈদিক সংস্কৃতিতে বরুণকে পাতালবাসী নাগদের রাজা হিসেবে দেখানো হয়েছিল। দুই সভ্যতার বোঝাপড়ার প্রথম প্রমাণ দেখা যায় খ্রিস্টজন্মের অন্তত তিন শতাব্দী আগে— বুদ্ধ বা জৈন তীর্থঙ্করদের মাথার ওপর পঞ্চনাগের ছাতা ধরে থাকার ছবিতে। প্রাচীনতর সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসাবশেষেও সাপের দেখা মেলে বটে, কিন্তু গাঙ্গেয় উপত্যকার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। কালক্রমে বৈদিক বিষ্ণুর মূর্তিকল্পনায় দেখা গেল, তিনি বিপুল শেষনাগের কোলে অনন্তশয়নে শায়িত, সেই মহাসর্প ফণা তুলে তাঁর মাথাতেও ছাতা ধরে আছেন। শিবের প্রবেশ আরও নাটকীয়— তাঁর কণ্ঠলগ্ন বাসুকি প্রবল ভাবে ফোঁস ফোঁস করছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এক দিন যে নাগেরা ছিল ভয়ঙ্কর, তারা কী ভাবে ক্রমশ বৈদিক (বিষ্ণু) এবং অ-বৈদিক (শিব) দেবতাদের দেখাশোনার দায়িত্ব অর্জন করল। পরস্পরের বিরোধী নানা বিশ্বাসকে মিলিয়ে দেওয়ার যে আশ্চর্য ক্ষমতা ভারতীয় সভ্যতার চরিত্রে নিহিত, এটা তারই একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত।

বৌদ্ধ সংস্কৃতি ভারত থেকে রফতানি হয়েছিল, কপিরাইটের ঝকমারি ছিল না। অন্য নানা দেশে সাপের আরাধনার যে সব ধারা ছিল, এই সংস্কৃতি সেগুলি আত্মসাৎ করে নেয়। বৌদ্ধ ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ নাগ হল মুচালিন্দা, এবং তিব্বতি নাগ জলাশয় ও অন্যান্য সম্পদের রক্ষাকর্তা হিসেবে পূজিত। খ্রিস্টপূর্ব একাদশ শতাব্দী থেকে চিনের রাজারা ড্রাগনকে পুজো করতেন, অর্ধেক কুমির এবং অর্ধেক সাপ রূপে, তবে তার অন্য কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যও ছিল। প্রথম চিনা সম্রাট হুয়াংতি সাপকে তাঁর প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। হং ড্রাগন হল এক রামধনু-সদৃশ সাপ, আর বাশে ড্রাগন আবার এক অতিকায় অজগর। জাপানে পবিত্র ইয়ামাতা-নো-ওরোচি ড্রাগন আসলে এক বিরাট সাপ, তার আটটা মাথা এবং আটটা লেজ। আমাতেরাসু-কামি নামক শিন্তো দেবতাও তা-ই। কোরিয়াতেও অনুরূপ ঐতিহ্য প্রচলিত, বিশাল আকৃতির সাপ ও অন্য সরীসৃপরা সেখানে ড্রাগন হিসেবে আরাধ্য। ভিয়েতনামে ড্রাগনের কল্পনায় আবার সাপ, কুমির এবং গিরগিটির সঙ্গে পাখিও মিশেছে।

খ্রিস্টীয় ঐতিহ্যে সেন্ট জর্জের ড্রাগন বধের ছবিতে এর ঠিক বিপরীত ধারণা দেখতে পাই। তবে সেমাইটিক ধর্মগুলিতে সাপকে শয়তান হিসেবে দেখানোর আগে প্রাচীন ইউরোপ, পারস্য, পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকাতেও সাপের আরাধনা প্রচলিত ছিল। অনেক দূরের প্রাচীন মেক্সিকোয় আজটেকরা কেৎসল-কুতেল-এর আরাধনা করত, সে হল পাখনাওয়ালা সাপ।

ভারতে ফিরে আসা যাক। দক্ষিণ ভারতে নাগপঞ্চমীতে বোনেরা ভাইদের রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা করে, আর উত্তর ভারতে এটা হয় দশ দিন পরে, রক্ষাবন্ধন-এ। কেরলের যুদ্ধে পারঙ্গম নায়ারদের সর্প-ভজনার একটা সমৃদ্ধ ঐতিহ্য আছে, মালয়ালিদের একটা বড় অংশ বছরের এই সময়টায় সর্প-কভু নামে পরিচিত অঞ্চলগুলিকে বিশেষ ভাবে শ্রদ্ধা জানায়। দক্ষিণ ভারতের অনেক প্রাচীন মন্দিরে পুরোহিত ও উপাসকরা এখনও গোখরো সাপকে খাবার দেন, আবার সর্পদোষ অর্থাৎ সাপের অভিশাপ কাটানোর জন্য ব্রাহ্মণ্য আচারের পাশাপাশি লৌকিক ঝাড়ফুঁকও প্রয়োগ করা হয়। এক শতাব্দী আগে নীলগিরির কাছে মান্নারঘাটে এডগার থার্স্টন এমনকী সাপ-মসজিদের কথা লিখেছিলেন।

মোটামুটি সাড়ে তিন হাজার বছর আগে ভারত সাপের সঙ্গে বেশ মসৃণ ভাবেই নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিল। সেই ঐতিহ্যের কথা ভাবতে গেলে বাসুকির কাহিনি মনে পড়বেই। সমুদ্রমন্থন নিয়ে দেবাসুরের সংগ্রামে তাঁর শরীরটিকেই ব্যবহার করা হয়েছিল। দুই মহাশক্তির এই সংঘাতে বাসুকি ক্ষতবিক্ষত হন। তাদের মধ্যে এক সময় সন্ধি হয়। বাসুকি সেরে উঠেছেন কি না, আমরা জানি

না।

প্রসার ভারতীর সিইও। মতামত ব্যক্তিগত